নারী আন্দোলন এবং সমর্থন তৈরির কৌশল : একটি পর্যালোচনা

সোহেলা নাজনীন ও মাহীন সুলতান

প্যাথওয়েজ অফ উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট
ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট

ফেব্রুয়ারি ২০১০

ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট-এর **প্যাথওয়েজ অফ উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট গবেষণা কার্যক্রম** বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের গবেষক, সামাজিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত অথবা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। এই কার্যক্রম একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা কর্মসূচী Consortium এর অংশ যেখানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, সামাজিক আন্দোলন এবং শিক্ষাঙ্গনের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরি করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে নারীদের দৈনন্দিন জীবনে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এই Consortiumটি বিশ্বের পাঁচটি অঞ্চলের পাঁচটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত। দক্ষিণ এশিয়ায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট থেকে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে; মধ্যপ্রাচ্যে মিশরের কায়রোর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের Social Research Centre (SRC) থেকে মিশর, ফিলিস্তিন এবং সুদানে; দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিলের সালভাদরে বাহিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Nucleus for Interdisciplinary Women's Studies (NEIM) এবং আফ্রিকায় ঘানার ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের Centre for Gender Studies and Advocacy (CEGENSA) থেকে ঘানা, সিয়েরা লিওন এবং নাইজেরিয়ায় গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Development Studies এ গবেষণা কার্যক্রমের সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করছে। যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা বিভাগ (DFID) এর আর্থিক সহায়তায় এ গবেষণাটি সম্পাদিত হচ্ছে।

ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট সামগ্রিক পরিবর্তন বিষয়ক সাম্প্রতিক গবেষণা পরিচালনা, শিক্ষা প্রদান ও এ্যাডভোকেসী করার একটি প্রতিষ্ঠান। এটি প্রথাগত ধারণাকে প্রশ্ন করার জন্য এবং দারিদ্র্যতা, অসমতা ও ন্যায়বিচার বিষয়ে নতুন ভাবনা উন্মোচন করার ক্ষেত্রে একটি প্রকৃষ্ট স্থান।

ছবি : সামসুন নূর

ডিজাইন ও প্রিন্টিং : জার্নিম্যান

জামদানী নকশা : রুবী গজনবী। *নকশা*। বি এস সি আই সি। অক্টোবর, ১৯৮১

পরিবেশক : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউ পি এল), রেড ক্রিসেন্ট হাউস, ৬ষ্ঠ তলা, ৬১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ৪০ টাকা

এই প্রকাশনাটি যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা বিভাগ DFID–এর মাধ্যমে UKaid–এর সহযোগিতায় মুদ্রিত। তবে প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণভাবে গবেষকদের।

মুখবন্ধ

এই প্রতিবেদনটি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট প্যাথওয়েজ অফ উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট গবেষণা কার্যক্রম কর্তৃক পরিচালিত 'Building Constituencies by Women's Organizations' গবেষণার ওপর ভিত্তি করে লেখা। এই গবেষণাটি দু'জন গবেষক মাহীন সুলতান ও সোহেলা নাজনীন এর দ্বারা ২০০৮ সালে পরিচালিত। হেলাল হোসেন ঢালী গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়তা করেছেন। একটি উপদেষ্টা কমিটির তত্ত্বাবধানে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। এই কমিটিতে হামিদা হোসেইন, রওশন জাহান, শিরিন হক, সিমিন মাহমুদ এবং ফিরদৌস আজীম ছিলেন, যাঁরা সকলেই আমাদেরকে তাঁদের মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারীপক্ষ এবং উইমেন ফর উইমেন এর তথ্যদাতাদের, যাঁরা আমাদের জন্য তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে অকপটে বিনিময় করেছেন। আমরা আরও খুশী হব যদি নারী পুরুষের সমতার জন্য আমাদের এই গবেষণা সমর্থন তৈরি ও আন্দোলন গড়ে তোলা বিষয়ক ভাবনা ও তৎপরতার ক্ষেত্রে কিছু অবদান রাখতে পারে।

নারী সংগঠনগুলোর সমর্থন তৈরি বিষয়ক গবেষণাটি আরেকটি গবেষণা করছে। নতুন এই গবেষণাটির উৎস আগের গবেষণাটির মাঝে নিহিত রয়েছে। আন্দোলন নির্মাণের ক্ষেত্রে সম্পদের ভূমিকা কি- সে বিষয়টি নিয়ে ঘানার সাথে আন্তঃদেশীয় একটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং তা নেদারল্যান্ডের রয়াল ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট (Royal Tropical Institute of the Netherlands) সমন্বয়ে সম্পাদিত হয়েছে।

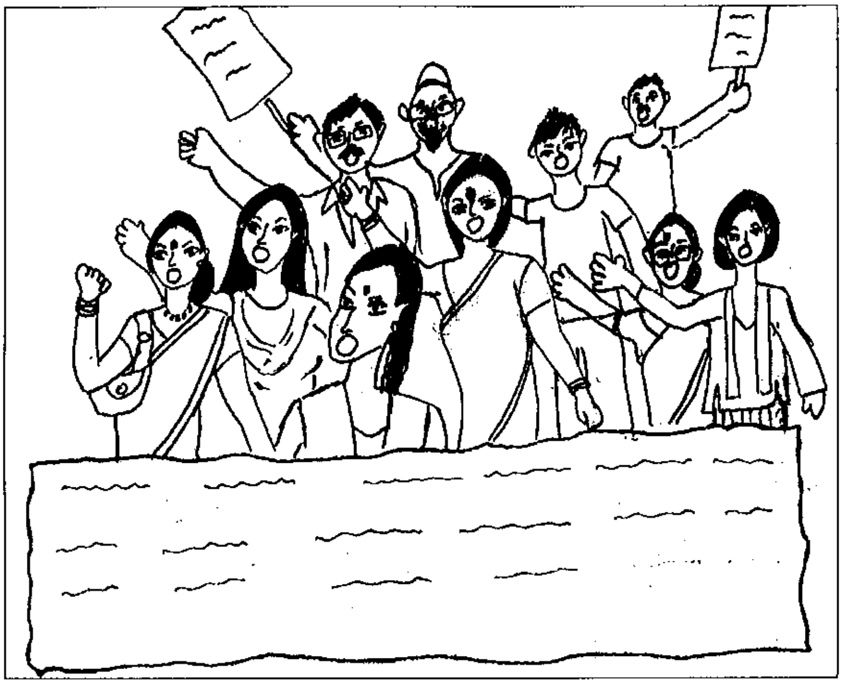

নারী আন্দোলন

নারী আন্দোলন এবং সমর্থন তৈরির কৌশল : একটি পর্যালোচনা

সোহেলা নাজনীন ও মাহীন সুলতান

সূচনা

বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকটিকে বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ বলে মনে করা হয়। এ সময় রাষ্ট্রের কাছে নারী আন্দোলন-সম্পর্কিত নানা ধরনের ইস্যু তুলে ধরার মতো বিশেষ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আলোচনা এবং পরবর্তী সময়ে 'প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন'কে ঘিরে নারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রের একধরনের সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি হয়। এই দশকে নারী সংগঠনগুলোর পরামর্শ বিভিন্ন মহলের কাছে নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। পরামর্শদাতা হিসেবে এসব সংগঠনের পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০ সালে গণতন্ত্রে উত্তরণের পর নারী অধিকারের বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধিতার ক্ষেত্রগুলোও আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে। তবে নারী-পুরুষ সমতা আনয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে বিপরীতধর্মী ভূমিকা পালন করতেও দেখা গেছে এ দশকে। রাষ্ট্র একদিকে নারীর পক্ষে নানা ধরনের আইন তৈরি করছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ও পুরুষদের সুবিধাবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার প্রয়াসও লক্ষ করা গেছে (Jahan 1995)।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি ও কাঠামোতে জেন্ডার ও শ্রেণীবৈষম্য বিদ্যমান (Goetz 2001; Nazneen 2008a)। উপরন্তু, বিদেশি সহায়তার ওপর নির্ভরতা ও আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিকায়ন নারী অধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডকে সীমিত করে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য নিশ্চিত করার জন্য দাতাদের নির্দেশিত নারী এজেন্ডা নিয়ে সরকারকে নারী উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়েছে। আবার আমলাদের মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলির ফলে নারী অধিকার সংক্রান্ত বিষয় দলীয় এজেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া নাগরিক সংগঠনগুলো প্রায়শ দলীয়করণের শিকার। ফলে তারা গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না (Hassan, 2002; Nazneen 2008b)।

এ প্রতিবেদনে দেশের জাতীয় পর্যায়ের তিনটি নারী সংগঠন নির্বাচন করা হয়েছে। এই তিন সংগঠন প্রথমত জেন্ডার সমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কীভাবে নিজেদের সদস্য, রাজনৈতিক দল, আমলা ও নাগরিক সমাজসহ বিভিন্ন মহলের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছে ('activation of commitment', Ryan 1992) এবং দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের বিষয়কে তারা কীভাবে অর্থবহ করে তুলছে, তা এ প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কেস স্টাডির জন্য নির্বাচিত তিন সংগঠন

এ গবেষণার জন্য নির্বাচিত সংগঠন তিনটি হলো বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (বামপ), নারীপক্ষ ও উইমেন ফর উইমেন (উফউ)। এ তিনটি নারী সংগঠনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড অনেক সংগঠনের জন্য উদাহরণস্বরূপ। সংগঠনগুলো যেভাবে নিজেদের কার্যক্রম বা আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষ ও অন্য সংগঠনগুলোর সমর্থন তৈরি করে এবং তা বজায় রাখতে যেসব কর্মকৌশল ব্যবহার করে, সেসব থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। যেসব আন্দোলনে সফল হয়েছে বলে নির্বাচিত সংগঠনগুলো মনে করেছে, সে আন্দোলনগুলোকে কেস স্টাডি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে। বর্তমান গবেষণায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশেষত সংসদ ও স্থানীয় পর্যায়ে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন, বিভিন্ন পর্যায়ে নারী প্রতিনিধিত্ব ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ইত্যাদি বিষয়ে সংগঠনটির কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংগঠন হিসেবে তুলনামূলকভাবে ছোট হলেও নারীপক্ষ রাষ্ট্র ও সমাজে বিদ্যমান নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা ও নারী-পুরুষের বিদ্যমান ক্ষমতায়নের অসম সম্পর্ককে সমতার দিকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। সংস্থাটি গঠিত হয় ১৯৮৩ সালে। ১৯৯৬ সাল থেকে এসিড-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নারীপক্ষের আন্দোলনকে এ গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নির্বাচিত তিনটি সংগঠনের মধ্যে উইমেন ফর উইমেন সবচেয়ে ছোট। এটি ১৯৭৩ সালে গঠিত হয়। সংগঠনটি প্রধানত রাষ্ট্রীয় নীতিসম্পর্কিত কাজের ওপর গুরুত্ব দেয়। জেন্ডারের মূলধারার নানা কাজের ওপর এ সংগঠনের অনেক কাজ রয়েছে। উইমেন ফর উইমেন 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' বা সিডও সনদ দ্রুত বাস্তবায়ন এবং সনদের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের ওপর রাষ্ট্রীয় যে আপত্তি আছে তা তুলে নেবার দাবী সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বিষয়ে নানামুখী কাজ করেছে।

পদ্ধতি

এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলন-প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে তিনটি নারী সংগঠনের সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও বিভিন্ন ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-প্রক্রিয়া ছিল রিফ্লেক্টিভ এবং পরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত তথ্য সাক্ষাৎকারদানকারী ও সংগঠনের অন্যদের সঙ্গে মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্যাকেজিং

সদস্য ও জোটের মধ্যে ঐক্যপ্রক্রিয়ায় আন্দোলনকারী সংগঠন কীভাবে বিভিন্ন মহলের কাছে ইস্যুটি উপস্থাপন এবং এর অর্থ তৈরি করে, কীভাবে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন তৈরির

ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে (Gamson, 1975)। এই পুরো বিষয়টাকে 'প্যাকেজিং' বলা যায়। একটি সংগঠনের আদর্শিক অবস্থান, জোট বা সমর্থকদের চরিত্র ও তাদের কাছে সংগঠনটি আন্দোলন-প্রক্রিয়ার ব্যাপারে কী প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম, তার ভিত্তিতে সেই সংগঠনের প্যাকেজিং নির্ধারিত হয় (Taylor and Rupp, 1991)। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতা ও একাত্মবোধ তৈরিতে প্যাকেজিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে (Tarrow, 1998)।

নারী সংগঠনগুলো তাদের আন্দোলনের ইস্যুগুলোকে প্যাকেজিং করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টিকে 'ক্ষমতায়নের' দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে। সংগঠনটি নিজেদের সদস্য, স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে সমর্থন তৈরির জন্য কাজ করেছে। এটা করতে গিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সমানভাবে অংশগ্রহণ কীভাবে নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নকে প্রভাবিত করে, তার ওপর জোর দিয়েছে। বিষয়টি তারা এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যাতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলোকে সমর্থকদের কাছে অন্যায় বলে মনে হয়। বামপ যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়, সংক্ষেপে তা নিম্নরূপঃ

'আমরা আমাদের সংগঠনের সদস্য ও নারীদের নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি যে, যত দিন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নারীরা অংশ না নিতে পারবে, তত দিন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও নারীরা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারবে না। নারী প্রতিনিধিরা তাই বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পুরুষ সহকর্মীদের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। এটা তাদের মধ্যে ক্রোধের জন্ম দিয়েছে। আমরা নারীদের এসব বিষয় উপলব্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করি। নারী-পুরুষ বৈষম্যের বিষয়ে তাদের সচেতন করার চেষ্টা করি' (সাক্ষাৎকার, বামপ ১, ১৪.০৭.০৯)।

বিরাজমান এই অসমতার কাঠামো সম্পর্কে সচেতনতা নারী সংগঠনগুলোর সদস্য, নারী প্রতিনিধি ও সাধারণ নারীদের কাজের মধ্যে একধরনের ঐক্য সৃষ্টিতে মূল ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ অন্যান্য নারী সংগঠন ও নাগরিক সমাজের কাছে একইভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করে, যেহেতু সংগঠনগুলো বিষয়টি একইভাবে উপলব্ধি করে থাকে।

রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রের সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আরও কিছু প্যাকেজিং কৌশল অবলম্বন করে। নির্বাচনকালে ও অন্যান্য সময়ে তারা রাজনৈতিক দল ও সরকারকে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারের কথা মনে করিয়ে দেয়। সংশ্লিষ্ট দল বা সরকার সে সময় কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাদের সামনে তাও তুলে ধরে। পাশাপাশি নানা ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জেন্ডার পক্ষপাতিত্বের বিষয়গুলোকে আলোচনার সামনে নিয়ে আসে। এ ক্ষেত্রে মহিলা পরিষদের কর্মকাণ্ড মূলত একটি

লবিং-সংগঠনের কর্মকাণ্ডের মতোই। এর কারণ হিসেবে সংগঠনটির ব্যাখ্যা হলো, মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ব্যাপারে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মতো অঙ্গীকারবদ্ধ নয়, তাই তাদের লবি করতে হয়।

এই প্যাকেজিং প্রক্রিয়ার মিশ্র ফলাফল দেখা গেছে। এই প্রক্রিয়ায় কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নিজেদের সদস্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের সমর্থন আদায় করতে পেরেছে। এ বিষয়ে তাদের প্রচারণা দেশব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে তারা সফলতাও অর্জন করেছে। কিন্তু রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে তাদের এই সফলতা তুলনামূলকভাবে কম। রাজনৈতিক দলগুলোকে এসব বিষয়ে কাজ করতে রাজি করানো খুব কঠিন। বিশেষত, ভোটের কথা মাথায় রেখে রাজনৈতিক দলগুলো নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না। নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর নানা ধরনের বিরোধিতার সফল মোকাবিলা তারা করতে পারেনি। এ ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর আশঙ্কা, সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে নারীদের আসনসংখ্যা বাড়ানোর ফলে তারা আসন হারাতে পারে। এই আশঙ্কা থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর উত্তরণের উপায় বের করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সফল হতে পারেনি।

নারীপক্ষের এসিড-বিরোধী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল এসিডে আক্রান্তদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও ন্যায়বিচারের বিষয়গুলো নিয়ে রাষ্ট্র যাতে কাজ করে। শুধু আক্রান্তদের যথাযোগ্য সেবাদান নিশ্চিত করা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই সংগঠনটির একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। এসিড-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা তৈরি এবং আক্রান্তদের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা ও সমর্থন বাড়ানোও তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল। এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য নারীপক্ষ এসিড-বিরোধী আন্দোলনের বিষয়টি সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে যুক্ত করেছে। আক্রান্ত ও তাদের পরিবারের ওপর চাপ প্রতিহত করা, আক্রান্তদের স্বাস্থ্যসহায়তা ও আইনি সমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি অপরাধ প্রতিরোধের বিষয়গুলোর ওপর তারা জোর দিয়েছে। মূলত এসিড-সন্ত্রাসের মতো মারাত্মক অপরাধের বিরুদ্ধে সমাজ ও সমাজের মানুষের যা যা করণীয়, সেগুলো নিশ্চিত করার জন্যই নারীপক্ষের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। আক্রান্তদের জন্য যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষে এসব প্যাকেজিংয়ে তাদের প্রতি সেবাপ্রদানকারীদের সহমর্মিতা তৈরির কাজটি নারীপক্ষের জন্য জরুরি ছিল। নারীপক্ষের একজন সদস্য বলছিলেন:

'আক্রান্ত ব্যক্তি যাতে একটি সংবেদনশীল পরিবেশ পায়, সে জন্য আমরা বারবার চেষ্টা করি। আমরা আক্রান্ত নারীদের এ সম্পর্কে কথা বলতে উৎসাহিত করি, যাতে তাদের ও তাদের পরিবারের ট্রমা, কষ্ট ও বেদনার বিষয়গুলো সবার সামনে উঠে আসে। আপনি যদি তাদের কথাগুলো শোনেন বা তাদের অবস্থা দেখেন, তাহলে তাদের কষ্ট ও বেদনাকে উপেক্ষা করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে' (সাক্ষাৎকার, নারীপক্ষ ২, ১০.০৯.০৮)।

এ ধরনের প্যাকেজিং কৌশল গ্রহণের আরেকটি কারণ, আক্রান্ত ব্যক্তিদের– যারা মূলত কিশোরী ও তরুণী– নৈতিক চরিত্র নিয়ে সেবাপ্রদানকারীদের রক্ষণশীল মনোভাব যাতে তাদের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত ও ব্যাহত না

করে। কৌশলটি বিশেষ করে আদালত পর্যায়ের কার্যক্রমে সফল, যেখানে আসামিপক্ষ নিজেদের রক্ষা করার জন্য আক্রান্ত নারীদের নৈতিক চরিত্রের বিষয়ে নানা ধরনের বক্তব্য উত্থাপন করে।

আক্রান্তদের প্রতি সহমর্মিতা বাড়ানোর কৌশল থাকায় 'ভালো মেয়ে'র গ্রহণযোগ্য আচরণের সামাজিক সংজ্ঞা নিয়ে নারীপক্ষ বিতর্কে যায়নি। কিশোরী বয়সের প্রেম ও যৌনসম্পর্কের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে মানুষের সামনে নয়, 'নিরাপদ' পরিবেশে; যেমন নারীপক্ষ অফিসে (সাক্ষাৎকার, এনপি ৪, ০২.১২.০৮)। বৃহত্তর সমাজে বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য কৌশল হিসেবে নারীপক্ষ প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অধিকারকে তরুণীদের প্রজননস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ও নিজের শরীরের ওপর নিজের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

নাগরিক সমাজে সমর্থন তৈরির জন্য উইমেন ফর উইমেন সিডওর পূর্ণ বাস্তবায়নের বিষয়টি নারীদের জন্য একটি 'বিল অব রাইটস' হিসেবে উপস্থাপন করে। সিডও বাস্তবায়ন কেন দরকার, তা তুলে ধরার জন্য সংগঠনটি নাগরিক সমাজের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে (সাক্ষাৎকার, উফউ ১, ৩০.০৭.০৮)। নারীদের বৈষম্যের প্রকৃতি চিহ্নিত করা দরকার এবং এ বৈষম্য থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে সিডও অনুচ্ছেদের সঙ্গে বৈষম্য দূর করার উপায়ের সম্পৃক্ততা দেখানো জরুরি। এ কারণে সংগঠনটি সিডওর নানা অনুচ্ছেদের সঙ্গে বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশনের (পিএফএ) নানা অনুচ্ছেদের সংযোগ দেখানোর মতো কাজ করে যাচ্ছে। উইমেন ফর উইমেনের একজন সদস্য বলছিলেন:

'আমরা যখন মাঠপর্যায়ে কাজ করতে যাই, তখন প্রথম যে প্রশ্নটির মুখোমুখি হতে হয় সেটি হচ্ছে, 'সিডও কী?' আমরা বলি যে এটা একটা দলিল। এর ফলে অনেকে ধরে নেয়, এটা জমিজমার সাথে সম্পৃক্ত কিছু একটা। সুতরাং আমরা পুরো বিষয়টিকে নারীর অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছি' (সাক্ষাৎকার, উফউ ৩, ৩০.০৭.০৮)।

এই বিষয়গুলো নিয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার সময় উইমেন ফর উইমেন সচেতনভাবেই 'আইনগত' অবস্থান গ্রহণ করে। এর কারণ মূলত দুটো। প্রথমত, এতে করে ধর্মবিরোধিতার অভিযোগ এড়ানো যায়। দ্বিতীয়ত, যাতে সিডও নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র বা দরকষাকষির সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। আইনগত অবস্থান তৈরির ক্ষেত্রে উইমেন ফর উইমেন যুক্তি দেখিয়েছে যে, বাংলাদেশ যেহেতু সিডও সনদে স্বাক্ষর করেছে, তাই সিডওর পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা এখন বাংলাদেশের জন্য বাধ্যতামূলক একটি কাজ। উইমেন ফর উইমেনের একজন সদস্য বলছিলেন:

'আমাদের আলোচনাগুলো শুধু আবেগ দিয়ে চালিত হয় না, আমরা বরং যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে অন্যদের বিষয়গুলো বোঝানোর চেষ্টা করি। আমরা দেখাই যে, কীভাবে ধর্মীয় দিক দিয়ে ব্যক্তিগত আইনে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কেন জেন্ডার সমতা সৃষ্টিতে সরকার সিডওর আওতায় কাজ করতে বাধ্য। আমরা আলোচনা জোরদার করার ক্ষেত্রে জাতীয় সংবিধানকে ভিত্তি করে কাজ করে থাকি' (সাক্ষাৎকার, ৩০.০৭.০৮)।

সংগঠনটি তাদের জোটে ও নাগরিক সমাজে একাত্মবোধ সৃষ্টি ও সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছে। এর কারণ মূলত দুটো। প্রথমত, সিডও বাস্তবায়ন নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে তারা যে ধরনের নাগরিক সংগঠনকে বেছে নিয়েছিল তারা সবাই সমমনা। সিডও বাস্তবায়নের সংগঠনটি তাদের ইস্যুগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। দ্বিতীয়ত, প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে বিতর্কিত বিষয়গুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষত এসব বিষয়ে দ্বিমতের জায়গাগুলো উপেক্ষা করার সময় এ প্যাকেজিং কৌশল কার্যকর হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে এই প্যাকেজিং কৌশল সিডও বাস্তবায়ন ইস্যুতে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তারা কর্মকর্তাদের সিডও বাস্তবায়ন কেন প্রয়োজনীয় ও তাদের কাজের প্রতি এটা যে কোনো হুমকি নয়, তা দেখাতে পেরেছে। এতে প্রমাণিত হয়, সরকারের সঙ্গে কীভাবে আলোচনা করতে হয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি কীভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়, সে ব্যাপারে সংগঠনটি সঠিক ও যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নারী বিষয়ে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টিতে এই প্যাকেজিং কৌশলের প্রভাব সামান্য। কারণ, এ সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য তা লাভজনক হবে না। দ্বিতীয়ত, নারী সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ফলে তাদের বিরুদ্ধে দলীয়করণের অভিযোগ তৈরি হতে পারে, যা তাদের গ্রহণযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে তারা মনে করেছে।

নাগরিক সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি

তিনটি সংগঠনই তাদের কাজের প্রতি সমর্থন বাড়াতে, অ্যাডভোকেসি-প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করতে এবং এসব বিষয়ে রাষ্ট্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে নাগরিক সমাজ, বিশেষত নারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে জোট তৈরি করেছে। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নাগরিক সংগঠনগুলোর জোট বাঁধা এক অর্থে ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, একটি সংগঠন কার সঙ্গে জোট বাঁধছে, তার ওপর সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে নির্ভর করে। এসব জোটের একটি শক্তিশালী ও কার্যকর ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক সহায়তা। তা ছাড়া জোট তৈরির উদ্যোগ ও জোটে অন্য সংগঠনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারার ক্ষমতাও সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে।

এসিড-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নারীপক্ষের আন্দোলনের মাধ্যমে নানা জোটের জন্ম হয়েছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে আনুষ্ঠানিক জোট হচ্ছে এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশন (এএসএফ)। এই জোটের মূল উদ্দেশ্য এসিড-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যেসব সংস্থা কাজ করে তাদের একত্র করা, এসিড-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো ও কার্যক্রম গ্রহণ করা।

নারীপক্ষের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকেরা আক্রান্তদের একটি নিজস্ব নেটওয়ার্ক তৈরি করার চেষ্টা করেছে। নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য আক্রান্তদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগানো, যাতে তারা নিজেদের আক্রমণের শিকার থেকে সারভাইভার হিসেবে ভাবতে শেখে।

এসিড-বিরোধী আন্দোলনে ইতিবাচক প্রচারণা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণমাধ্যমগুলোর সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্কও স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম দিকে নারীপক্ষের আশঙ্কা ছিল, গণপ্রচারমাধ্যম বিষয়টি 'মুখরোচক সংবাদ' হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। পরে দেখা গেছে, অনেক গণমাধ্যম এসিড-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্তরিকভাবেই তৎপর। তবে এসিড-বিরোধী কার্যক্রমের বিষয়গুলোতে নারীদের সামনে আনতে এবং তাদের প্রতি সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করতে নারীপক্ষকে প্রথম দিকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে নারীপক্ষ আক্রান্তদের বিষয়টি কীভাবে গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়, তা নিয়ে শঙ্কিত থাকায় আক্রান্ত নারী ও গণমাধ্যমের মধ্যে যোগাযোগের ধরন নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেরাই গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চেয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নারীপক্ষের মনোভাব ও ভূমিকা বদলে গেছে (সাক্ষাৎকার, এনপি ৪, ০২.১২.০৮)।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ২০০১ সালের নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি (এসপিসি) গঠন করে। এই কমিটি পরে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টিও সামনে নিয়ে আসে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মনে করেছে, অন্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে তারা আরও শক্তিশালী হতে পারে। তাদের মতে, এই জোটগুলো নির্দিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হয় ও নির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে কাজ করে। ফলে এগুলোকে বেশ সক্রিয় ও নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক কাজে তৎপর হতে দেখা যায়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের একজন সদস্য বলেছেন, 'যদি একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আস্তে আস্তে এই জোট নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, তখন আর জোটের প্রয়োজন হবে না' (সাক্ষাৎকার, বামপ ৩, ২৯.০৭.০৮)।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মতে, এমন কিছু ইস্যু আছে যেগুলোতে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির (এসপিসি) সদস্যরা কাজ করতে রাজি হন এবং যৌথ অবস্থান নিতে পারেন। তবে সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য জোটের সদস্যবৃন্দ এই ইস্যুগুলো নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা করেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত যে হয় না, তা নয়। এসব বিষয়ে দ্বিমত থাকলে কী করা হয় জানতে চাইলে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের একজন সদস্য জানান, 'প্রতিটি সংগঠনই এ বিষয়গুলো নিয়ে নিজেদের মতো করে কাজ করে। আর কিছু মতপার্থক্য তো থাকতেই পারে। এগুলো আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়' (সাক্ষাৎকার, বামপ ৩, ২৯.০৭.০৮)।

নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়ে গণমাধ্যমের আগ্রহ সৃষ্টিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সফল হয়েছে। এ বিষয়ে যা ঘটছে গণমাধ্যমগুলো তা পর্যবেক্ষণ করছে; নারী সংগঠনগুলোর উদ্যোগগুলোকে প্রচার করছে। গণমাধ্যম নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিষয়ে দল বা সরকারের ভূমিকা জনমানুষের সামনে তুলে ধরছে।

উইমেন ফর উইমেন অন্য দুটি সংস্থার তুলনায় জোট তৈরি করেছে কম। এ ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম হলো, বেইজিং-প্রক্রিয়ার আগে ও পরে স্থানীয় পর্যায়সহ তারা বিভিন্ন নারী সংগঠনের কাছে সিডওর বিষয়টি তুলে

ধরার চেষ্টা করেছে। বেইজিং সম্মেলনের সময় তাদের পরিচালিত একটি চাহিদা মূল্যায়নের প্রক্রিয়া থেকে জানা যায়, বেইজিং-প্রক্রিয়া ও সিডও নিয়ে তথ্যের ঘাটতি ছিল। এ কারণে ১৯৯৫ সালে ন্যাশনাল কমিটি ফর বেইজিং প্রিপারেশনসের (এনসিবিপি) জন্ম হয়। পরে এটি ন্যাশনাল কমিটি ফর বেইজিং প্লাসে রূপান্তরিত হয়। তৃণমূল পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতের যে ব্যাখ্যা উফউ-এর একজন সদস্যের কাছে পাওয়া গেল তা হলো

'এনসিবিপি নেটওয়ার্কের কর্মকান্ডের ফলে উইমেন ফর উইমেনকে তৃণমূল পর্যায়ে যেতে হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। কিন্তু জোট গঠনের মাধ্যমে সহজেই আমরা ঢাকার বাইরের অন্যান্য স্থানীয় সংগঠনের কাছে পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছি। এর কারণ, ঢাকার বাইরের সংগঠন যত বেশি সম্ভব, এ ধরনের জোটে যোগ দিতে আগ্রহী' (সাক্ষাৎকার, উফউ ১, ৩০.০৭.০৮)।

সিডও-সম্পর্কিত একটি জোট হলো 'নাগরিক উদ্যোগ'। ২০০৯ সালে এই জোট জাতিসংঘের সিডও কমিটির জন্য খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছিল। উইমেন ফর উইমেন এই জোটের সঙ্গে যুক্ত। এ রকম একটি বড় জোটে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে উইমেন ফর উইমেন সিডওর তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্ককে ব্যবহার করে দেশীয় পরিপ্রেক্ষিত ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণের সুযোগ পায়। এই প্লাটফর্মটিকে ব্যবহার করে তারা সিডও সনদের কিছু অনুচ্ছেদে এখনো যে সরকারের আপত্তি রয়েছে, সেগুলো তুলে নেওয়ার ব্যাপারে কাজ করতে পারছে।

আমরা দেখি যে, নাগরিক সমাজের সমর্থন আদায়ের জন্য জোট গঠনের কৌশল সব নারী সংগঠনই ব্যবহার করছে। জোটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরেও সংগঠনগুলো দৃশ্যমান হয়, তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। এমনকি তাতে স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোও কাজের সুযোগ পায়। ফলে জোটে অন্তর্ভুক্ত সকল পর্যায়ের সদস্যরা অনেক বেশি লাভবান হয় (Goetz and Hassim, 2003)। পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি সংগঠনগুলোকে জোটে যোগদান ও জোটের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। নারীপক্ষ ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ উভয়ই জোটের সদস্যদের মতভিন্নতা সম্পর্কে সচেতন। সংগঠন দুটো জোটের সদস্যদের এই মতভিন্নতাকে নির্দিষ্ট করা ও সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রেও সচেতন থাকে।

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নারী সংগঠনের সম্পৃক্ততা নিয়ে নারী সংগঠনগুলোর মধ্যে নানা ধরনের অবস্থান বা মতামত রয়েছে। উইমেন ফর উইমেন ও নারীপক্ষ মনে করে, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে তাদের লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি থাকে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের অবস্থান অবশ্য ভিন্ন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাক্ষাৎকারদানকারী বলেন, নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা ছাড়া সম্ভব নয়। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যাপারে প্রধান দুটি দলের সম্মতি আদায় করা গেলেও তার বাস্তবায়নে কেউই এগিয়ে আসেনি। দলগুলো মনে করেছে, এতে পুরুষদের ক্ষমতা কমে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে; দলগুলো আসন হারাতে পারে। ফলে সংসদে নারীদের কার্যকর প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত হয়নি। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জানায়, এরপর তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। 'আমরা এখন দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের সভায় অংশগ্রহণ করি না। রাজনীতির চরিত্র বদলে গেছে। এছাড়াও নারী আন্দোলনের নিজস্ব রাজনীতি রয়েছে' (সাক্ষাৎকার, বামপ ৩, ২৯.০৭.০৮)।

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ফলে নিজেদের সুনাম ও সুখ্যাতির কোনো ক্ষতি হয় কি না, সে ব্যাপারে নারীপক্ষ ও উইমেন ফর উইমেন উভয়ই সচেতন। নারীপক্ষ সচেতনভাবেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা পরিহার করে। নারীপক্ষের একজন সদস্য বলেছেন, 'কীভাবে বললে রাজনীতিবিদেরা বুঝবেন' তারা তা বুঝতে পারেন না। তবে সংগঠনটি নির্দিষ্ট ইস্যুকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তারা মনে করেন, জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দল বা তাদের নীতির সঙ্গে কাজ করার চেয়ে স্থানীয় রাজনীতিকদের সঙ্গে কাজ করাটা সহজতর।

উইমেন ফর উইমেন স্বীকার করে যে, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে দুর্বল। 'আমাদের আসলে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। আমরা এনসিবিপির মাধ্যমে নানাভাবে চেষ্টা করেছি, সেমিনারের আয়োজন করেছি, কিন্তু কখনোই তাদের সহায়তা পাইনি' (সাক্ষাৎকার, উইমেন ফর উইমেন ২, ১৬.০৮.০৮)।

নারী-পুরুষ সমতার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব ও অঙ্গীকারের বিষয়ে নারী সংগঠনগুলোর মধ্যে প্রশ্ন আছে। রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন নারী সংগঠনকে তাদের কর্মকাণ্ডের কোনো ধরনের অংশ বলে মনে করতে চায় না এবং তাদের কাছে কাজের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী নয়। যদিও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতাকে মোকাবিলার বিষয়টি রাজনৈতিক দলের নানা দলিলে অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু সেটি নারী সংগঠনগুলোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে কি না, তা পরিষ্কার নয়। রাজনৈতিক দলে নারী সংগঠনগুলোর প্রভাব সীমিত। সে কারণে তারা রাজনৈতিক দলের মূল কর্মকাণ্ডে নারী অধিকার ও নারী-পুরুষ সমতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি।

রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততা

রাষ্ট্রের সঙ্গে নারী আন্দোলনের সম্পৃক্ততা কখন, কী পর্যায়ে ও কী উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত এবং এই সম্পৃক্ততা কোন ধরনের রাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়ে সংগঠনগুলোর বিভিন্ন অবস্থান রয়েছে। ১৯৯০-এর

আগে এই বিতর্কের মূল ফোকাস ছিল একটি স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে নারী সংগঠনগুলোর সম্পৃক্ততা সেই ব্যবস্থাটিকে বৈধতা দেয় কি না। ১৯৯০-পরবর্তীকালে আলোচনার ফোকাস সেখান থেকে সরে এসেছে। বর্তমানে আলোচনা মূলত রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন ধরনের সম্পৃক্ততার ফলে বৃহত্তর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব এবং রাষ্ট্রীয় সেবাদানব্যবস্থা ও নীতিমালায় কীভাবে পরিবর্তন আনা সম্ভব– এসব বিষয় ঘিরে হয়ে থাকে।

উইমেন ফর উইমেনের কাজের ক্ষেত্রগুলোতে; বিশেষ করে, সিডও ইস্যুতে রাষ্ট্রই আন্দোলনের মূল লক্ষ্যবস্তু। সরকারি পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে ভালো সম্পর্কের কারণে উইমেন ফর উইমেন তাদের ইস্যুগুলো আরও জোর দিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উপস্থাপন করতে পেরেছে। তাদের সদস্যরাও সরকারি কাঠামোর বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত ছিলেন, যা নারী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বিষয়ে সরকারকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে সিডও সনদের পূর্ণ বাস্তবায়নের বিষয়েও আলোচনা করা গেছে। উইমেন ফর উইমেনের যুক্তি– নিজের স্বার্থেই সরকারের সিডও সনদ সমর্থন করা দরকার এবং এ বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি ও তা বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান বাধাগুলো দূর করার জন্য অগ্রসর হওয়া দরকার। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক, সরকারের জন্য আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা একটি বড় ব্যাপার। সংগঠনটি জাতিসংঘের সিডওকে ব্যবহার করে এ বিষয়ে সরকারের কাজগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরছে।

নারী অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নারীপক্ষ রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত ও স্থায়ী করতে চেয়েছে। তাদের যুক্তি, 'আমরা আজ এখানে একটা সংগঠন হিসেবে আছি, কাল হয়তো থাকব না, কিন্তু সরকারি কাঠামো বিদ্যমান থাকবে সব সময়...' (সাক্ষাৎকার, নারীপক্ষ ৩, ১৪.০৯.০৮)। একজন উত্তরদাতা বলছিলেন, 'সরকারকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সহায়তা করাই আমাদের মূল কাজ। সুতরাং তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিই এখানে মূল ইস্যু' (সাক্ষাৎকার, নারীপক্ষ ৩, ১৪.০৯.০৮)। তারা মনে করেন, এসিড-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকারি সেবাদানপ্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী ও কার্যকর হওয়া প্রয়োজন।

অধিকাংশ সময়েই রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, নীতি ও এর বাস্তবায়নের মধ্যে বেশ দূরত্ব রয়ে যায় এবং ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ না করলে অনেক নীতিই কাগজে পড়ে থাকে।

বামপন্থী রাজনীতির প্রভাবের ফলে রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুক্ত হওয়াটা মাঝেমধ্যে কঠিন হয়ে পড়ে; বিশেষ করে, তারা যখন সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে একমত হতে পারেন না। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে, নব্বইয়ের দশকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে কৌশলে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে তারা তাদের কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নারীপক্ষের একজন সদস্য বলছিলেন:

'আমরা যদি আইন বদলাতে চাই, তাহলে আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও এর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের কাছে যেতে হবে। এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য আমরা রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে উপেক্ষা করতে পারি না' (সাক্ষাৎকার, বামপ ২, ১৮.০৭.০৮)।

তিনটি সংস্থাই রাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগতভাবে ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংযুক্ত হয়ে নানা ধরনের পরিবর্তন আনতে চেয়েছে। নানা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা বাড়াতে তারা তৎপর। কিছু কিছু কাজ যা শুধু রাষ্ট্রের পক্ষে করা সম্ভব, সে বিষয়গুলো রাষ্ট্রের উপলব্ধিতে আনার চেষ্টা করছে। উইমেন ফর উইমেন সিডও সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন ও ফলোআপ করার কাজ করে যাচ্ছে। নারীপক্ষ রাষ্ট্রের সেবাদান প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারণীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র ও স্তরে নানাভাবে যুক্ত রয়েছে। যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইস্যুতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কাজ করে গেছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে এসব সংগঠন কার্যকর সুযোগ তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। রাষ্ট্রও সংস্থাগুলোর সঙ্গে একইভাবে কাজ করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা নেয় বা উপেক্ষা করে।

ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত যোগাযোগ আলোচ্য কাজের ক্ষেত্রে একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। উপর্যুক্ত তিনটি সংস্থাই তাদের কাজে ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে থাকে। আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় কারা কারা থাকবে বা কাজ করবে, তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Tarrow, 1998)। ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক, সেটা পারিবারিক বা অন্য যেকোনো ধরনের হোক, পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি ও পরস্পরের ওপর আস্থার পরিবেশ তৈরি করে– যা মানুষকে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ ধরনের ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক সংগঠনগুলোর নীতিগত ও কর্মকাণ্ডজনিত অবস্থানকে পুরোপুরি প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশ সহায়তা করেছে।

রাষ্ট্রের সেবাদান পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষের বিরোধিতা মোকাবিলা, নারীপক্ষের ভূমিকার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সেবাপ্রদানকারীদের বিরোধের জায়গাগুলোকে কমিয়ে আনা এবং এসব ইস্যুতে দ্রুত ও কার্যকর প্রভাব সৃষ্টিতে নারীপক্ষ ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেছে। শুরুতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ও পুলিশ স্টেশনকে পর্যবেক্ষণ করার বিষয়টি নারীপক্ষের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব হিসেবে থাকলেও সরকারি কর্মকর্তারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। নারীপক্ষের একজন সদস্য জানান তারা সফলভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পেরেছিলেন, কারণ-

'আমরা আমাদের কাজে সফল হই, কারণ আমাদের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের চেনেন। এই ব্যক্তিরা আইনমন্ত্রী বা স্বাস্থ্যসচিব বা উচ্চপর্যায়ের সরকারি ডাক্তার যে কেউই হতে পারেন। আমরা জানি যে আমাদের

কাজের সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তাদের একমত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মূল ব্যক্তিদেরকে আমাদের সঙ্গে পেতে হবে' (সাক্ষাৎকার, নারীপক্ষ ২, ১০.০৯.০৮)।

উইমেন ফর উইমেনের অনেক সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত; তাদের পরিবারের সদস্য বা সাবেক অনেক শিক্ষার্থী রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। রাষ্ট্রের কাজের সঙ্গে যুক্ত এসব ব্যক্তির সঙ্গে সে জন্য যোগাযোগ করাটা তুলনামূলকভাবে সহজ। উইমেন ফর উইমেনের একজন সদস্য বলছিলেন:

'আমাদের সবারই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ বা সম্পৃক্ততা রয়েছে। সরকারের অনেক সচিবই আমাদের ছাত্র ছিলেন। অনেকে আমাদের জুনিয়র, যারা আমাদের সঙ্গে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে। আমাদের পরিবারের সদস্যরাও সরকারি অফিসার হিসেবে কাজ করছে। আমরা যদি কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে চাই, কোনো অনুরোধ করি, তারা সেটাকে উপেক্ষা করতে পারেন না' (সাক্ষাৎকার, উইমেন ফর উইমেন ১, ৩০.০৭.০৮)।

তা ছাড়া নব্বইয়ের দশকে উইমেন ফর উইমেন যখন সিডও নিয়ে কাজ করছিল, তখন তাদের অনেক সদস্যই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে কর্মরত ছিলেন। এটা নারী-পুরুষ সমতার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নানা ফোরামে উত্থাপন এবং এ ক্ষেত্রে বাধাগুলো শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। উইমেন ফর উইমেনের একজন সদস্যের পর্যবেক্ষণ:

'আমাদের সঠিক জায়গায় সঠিক ব্যক্তি ছিল। পরিকল্পনা কমিশনে যেমন আমরা ছিলাম, তেমনি দাতা সংস্থাগুলোর সঙ্গেও আমাদের অনেক সদস্য কাজ করেছেন। নানা স্তরের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেন্ডার বিষয়টিকে তুলে ধরার সুযোগ আমাদের ছিল। যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে আমাদের পরিচিত মানুষ ছিলেন, তাই নানা ধরনের আমলাতান্ত্রিক বাধা আমাদের পোহাতে হয়নি। আমরা এ ব্যাপারে দরকষাকষি বা আলোচনা করতে পেরেছি' (সাক্ষাৎকার, উফউ ২, ১৬.০৮.০৮)।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ফলাফলের জন্য ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক একটি প্রাথমিক কৌশল হিসেবে কাজ করে। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে সহায়তার ক্ষেত্রেও একই কৌশল প্রয়োগ করা হয়। একজন সদস্য জানাচ্ছিলেন যে, কাজের কৌশল হিসেবে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

'দলের মধ্যে যারা প্রগতিশীল বলে পরিচিত, যাদের আমরা চিনি, তাদের সঙ্গে আমরা কাজ করার চেষ্টা করি' (সাক্ষাৎকার, বামপ ২, ১৮.০৭.০৮)।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সংগঠনগুলোর আন্দোলনে টিকে থাকা ও সফলতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক জোট গঠনে সহায়তার পাশাপাশি রাষ্ট্রযন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রতিবন্ধকতাগুলোকে দূর করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত তিনটি সংগঠন কী কী কৌশল অবলম্বন করে তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি অন্যদের সমর্থন তৈরি করছে, এই গবেষণায় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, প্যাকেজিং তৈরির মাধ্যমে ও জোট বা সমর্থকদের সঙ্গে কৌশলগত ঐক্যপ্রক্রিয়ায় সংগঠনগুলোর নির্দিষ্ট ইস্যুর জন্য অন্যদের কাছে এ-সম্পর্কিত কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাদের এই কৌশলগত ঐক্যপ্রক্রিয়ার ফলে নারী-পুরুষ সমতার বিষয়গুলো শুধু তাদের সমমনা সংগঠন বা জোটের ক্ষেত্রে নয় বরং অন্যদের কাছেও পৌঁছায়।

তিনটি সংগঠনই কাজের ক্ষেত্রে তাদের সসদ্যদের সঙ্গে ভিন্নভাবে কাজ করে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে তারা একই ধরনের কৌশল প্রয়োগ করে। একই ধরনের কৌশলের ব্যবহার ইঙ্গিত করে যে, এই নারী সংগঠনগুলো যে পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন করে তার বিভিন্ন দিক যেমন– রাষ্ট্রের প্রকৃতি, নাগরিক সমাজের দলীয়করণ, রাজনীতির ধরন ইত্যাদি তাদের কৌশলকে প্রভাবিত করেছে। তা ছাড়া জোট তৈরি ও জোট পরিচালনায় নানা রকম সমস্যা হতে পারে। জোটের মধ্যে বিভিন্ন সদস্যের সক্ষমতা ও জোটের গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য জোট সৃষ্টিকারী সংগঠনগুলো জোটের এজেন্ডা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আন্দোলনকে গতিশীল করার বিষয়টি কতটুকু স্থায়ী হতে পারে, সে প্রশ্নও এখানে উঠে এসেছে। এ ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অসম্পৃক্ততা সংগঠনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। যেসব সংগঠনের কর্মকাণ্ড এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তারা কীভাবে তাদের সমর্থকদের বিশেষত এনজিও, নাগরিক সমাজ, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও নিজেদের সদস্যদের ব্যাপক সমর্থন আদায় করছে তা এখানে উঠে এসেছে। সংগঠনগুলো তাদের সদস্যের বাইরে অন্যদেরও তাদের পক্ষে আনতে চেয়েছে। এটা করতে এবং তাদের সংগঠন ও আন্দোলনের বিষয়গুলোর গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে গিয়ে বিষয়ের উপস্থাপন ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তাদের কিছু ছাড় দিতে হয়েছে। তবে এই ছাড় দেওয়ার ফলে সংগঠনগুলো তাদের এজেন্ডা বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

References

Cook, J. A., and Fonow M. M. (1991). *Beyond Methodology Feminist Scholarship as Lived Research*, Indiana: Indiana University Press

Gamson, W. (1975). *The Strategy of Social Protest*. Illinois: Homewood

Goetz, A. M. (2001). *Women Development Workers*. Dhaka: University Press Limited.

Goetz, A. M., and Hassim, S. (2003). *No Short Cuts to Power: African Women in Politics and Policy Making*. London and New York: Zed Books

Hassan, M. (2002). *The Demand for Second Generation Reform: The Case of Bangladesh.* Doctoral Thesis in Development Studies, Institute of Commonwealth Studies, University of London.

Jahan, R. (1995). Men in Seclusion and Women in Public: Rokeya's Dreams and Women's Struggles in Bangladesh. In A. Basu (Ed..), *The Challenge of Local Feminism: Women's Movement in Global Perspective* (pp. 87-109) Boulder, Co: Westview Press.

Nazneen, S. (2008a). Gender Sensitive Accountability of Service Delivery NGOs: BRAC and Proshika in Bangladesh. PhD Thesis in Development Studies, Institute of Development Studies, University of Sussex.

Nazneen, S. (2008b). Group Discrimination at Elections: Bangladesh. In D. Mendis (Ed.), *Electoral Process and Governance in South Asia*. London and New Delhi: Sage Publications.

Ryan, B. (1992). *Feminism and Women's Movement*. London: Routledge.

Tarrow, S. (1998). *The Power in Movement*. Cambridge: Cambridge University Press.

Taylor, V., and Rupp, L. J. (1991).Researching Women's Movements. In M. M. Cook and J. A. Fonow (Eds.), *Beyond Methodology: Feminist Scholarship as Lived Research*, Indiana: Indiana University Press

প্যাথওয়েজ অফ উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট গবেষণা কার্যক্রম
ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট

৬৬ মহাখালি বা/এ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮২৪০৫১-৪, এক্সটেনশন: ৪০৯৯, ৪০৭০
pathwayssa@gmail.com

BRAC UNIVERSITY BDI BRAC DEVELOPMENT INSTITUTE

pathways of women's empowerment